প্রথম আলো

কলাম

অভিমত-বিশ্লেষণ

লটারি বনাম পরীক্ষার বিপরীতে কি কোনো বিকল্প নেই

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিয়ে দুই পর্বে লিখেছেন সৌমিত জয়দ্বীপ। আজ প্রকাশিত হলো **প্রথম পর্ব**

সৌমিত জয়দ্বীপ

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক

আপডেট: ১৯ জুন ২০২৬, ১৮: ৪৪

সৌমিত জয়দ্বীপ

যাঁরা বলেছিলেন, লটারি একটি ভালো সমাধান, তাঁদের কথা অর্ধসত্য। যাঁরা বলছেন, ভর্তি পরীক্ষা লটারির চেয়ে উত্তম, তাঁদের কথাও অর্ধসত্য। আমাদের এই বাইনারির বাইরে চিন্তা করতে পারতে হবে। বিশেষত, প্রাথমিক শিক্ষায়। সম্প্রতি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ২০২৭ সালে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা চালু করবে। মানে, মেধার লিখিত প্রমাণ ছাড়া ভর্তির সুযোগ নেই!

মনে রাখা জরুরি, প্রতিযোগিতার বাজারে যেকোনো প্রবেশিকা পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য বর্জনমূলক, গ্রহণমূলক নয়। কাণ্ডজ্ঞানই বলে, পরীক্ষার মাধ্যমে যতজন কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে, তার চেয়ে কয়েক গুণ প্রার্থী বাদ পড়ে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষা কিংবা চাকরির পরীক্ষা—পরিস্থিতি অভিন্ন। এ পরিস্থিতির বিশুদ্ধকরণ হয়েছে 'মেধা' নামক এক প্রপঞ্চ দিয়ে। প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হলে কেউ মেধাবী, নইলে অমেধাবী!

আমরা যখন আসল জায়গায় হাত দিতে অনিচ্ছুক, তখন কখনো ভর্তি পরীক্ষা, কখনো লটারির বাইনারি নিয়ে সময়ক্ষেপণ করবই। শিক্ষাকে আমরা অধিকার দ্বারা নয়, সুযোগ দ্বারা নিরূপণ করেছি। এটা মূলত প্রচলিত সমাজকাঠামোকে আগলে রাখারই প্রয়াস। ফলে সর্বৈব বর্জনমূলক ব্যবস্থাই হয়েছে আমাদের অভীষ্ট।

আমরা ১৮৩৫ সালের ম্যাকওলে নীতি, ১৯৬২ সালের শরিফ শিক্ষা কমিশন কিংবা ১৯৮৩ সালের মজিদ খান শিক্ষা কমিশনের ধারাবাহিকতাই এ দেশে নানাভাবে পুনরুৎপাদন করেছি। যার নাম শিক্ষা সংকোচন নীতি—টাকা যার, শিক্ষা তার।

জিবাদের এই উন্নয়ন প্রকল্পে বশীভূত হয়ে আমরা একই শিক্ষাব্যবস্থায় গড়ে তুলেছি বহু মাধ্যম। ফলে শহুরে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, অভিজাত ও সচ্ছল শ্রেণির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট রাষ্ট্রের চোখ প্রান্তদেশের কুটিরে আলো ফেলতে চায়নি।

বহুস্তর বিন্যাস ও বেসরকারীকরণের সংকট

বাংলাদেশে 'ব্রেন ড্রেন' হয় উচ্চশিক্ষার পর—কথাটা আংশিক সত্য। আসলে শুরু হয় একদম প্রাথমিক স্তরেই। দেশীয় শিক্ষামাধ্যমকে পরিত্যাজ্য করে আমাদের বিদেশ গমনেচ্ছু অভিজাত অভিভাবক-মন সন্তানকে ভিনদেশি শিক্ষামাধ্যমে ভর্তি করানোর যে যুদ্ধে নামে, সেটাই কথিত 'ব্রেন ড্রেনে'র আরম্ভবিন্দু। বাকিটা ধারাবাহিকতা মাত্র।

বহু মাধ্যমে বিভক্ত বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার স্তরবিন্যাস অত্যন্ত জটিল। এক দেশীয় মাধ্যমেই শিক্ষাব্যবস্থা প্রাক্ প্রাথমিক, প্রাথমিক (প্রথম-পঞ্চম), উন্নীত প্রাথমিক (প্রথম-অষ্টম), নিম্নমাধ্যমিক (ষষ্ঠ-অষ্টম), মাধ্যমিক (নবম-দশম) ও উচ্চমাধ্যমিক (একাদশ-দ্বাদশ) স্তরে বিভক্ত হয়েছে। এ সুযোগে প্রাথমিক স্তরের মধ্যে নিম্নমাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক ও স্নাতক-স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের উত্তরোত্তর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পাশাপাশি একই বৈশিষ্ট্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনোটিতে প্রথম, কোনোটিতে তৃতীয়, কোনোটিতে ষষ্ঠ আর কোনোটিতে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা শিক্ষাব্যবস্থার জটিল কাঠামো ও জগাখিচুড়ি দশাকে আরও সংকটাপন্ন করেছে।

কেন ঔপনিবেশিক কাঠামো থেকে বেরিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা—তিনটি সহজ ও প্রধান স্তরে ভাগ করা সম্ভব হলো না, তা আজও এক রহস্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর ভিত্তিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে যথাক্রমে অষ্টম ও দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার পরিকল্পনা ছিল সরকারের। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের আর্টিকেল-২৮-এর ঘোষণা বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষাকে ২০১৮ সালের মধ্যে শতভাগ 'সর্বজনীন, অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও সবার জন্য একই মানের'

করার প্রতিশ্রুতি ছিল শিক্ষানীতিতে। বেসরকারি খাত থেকে বের করে এনে প্রাথমিক শিক্ষাকে শতভাগ জাতীয়করণের অঙ্গীকারও শিক্ষানীতিতে ব্যক্ত হয়েছিল। দুটির কোনোটিই কার্যত বাস্তবায়ন হয়নি। কয়েকটি উদাহরণ দিলে চিত্রটি পরিষ্কার হবে।

► কেন ঔপনিবেশিক কাঠামো থেকে বেরিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা—তিনটি সহজ ও প্রধান স্তরে ভাগ করা সম্ভব হলো না, তা আজও এক রহস্য। ► এই চারটি প্রবণতা—স্তরবিন্যাস, বেসরকারীকরণ, শহরায়ণ ও প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা—বোঝাপড়া না করে চলমান লটারি বনাম ভর্তি পরীক্ষার বাদানুবাদ নিরসন খুব কঠিন।

সর্বশেষ ২০২৪ সালের শিক্ষা পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় যুক্ত ১৪ ধরনের প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে মোট বিদ্যালয় ১ লাখ ১৮ হাজার ৬০৭টি। এর মধ্যে সর্বোচ্চসংখ্যকই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬৫ হাজার ৫৬৭টি, অর্থাৎ ৫৫ শতাংশ; আর দ্বিতীয়তে কিন্ডারগার্টেন—২৬ হাজার ২৯৯টি। মাধ্যমিক স্তরে ২১ হাজার ২৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ৬৯৪টি সরকারি, বাকি প্রায় ৯৪ শতাংশ বেসরকারি বিদ্যালয় (এমপিওভুক্ত, প্রাইভেট ইত্যাদি)।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০২০ সালে শিক্ষার্থী ছিল ৬৭ শতাংশ, ২০২৪ সালে নেমে হয়েছে ৫৩ শতাংশ। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মাত্র ৬১৯টি প্রতিষ্ঠানকে উন্নীত (আপগ্রেডেড) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা সম্ভব হয়েছে। অথচ ২০২০ সালেই ছিল ৬৭০টি।

অন্যদিকে প্রাথমিক-যুক্ত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০২৩ সালের ১ হাজার ৮৯২-এর বিপরীতে ২০২৪ সালে বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৭৬৭। ২০১০ সালের শিক্ষানীতির পরে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ‘স্কুল অ্যান্ড কলেজে’ রূপান্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ৫১৪টি হলেও এদের মধ্যে সরকারি মাত্র ৬৩টি। দেশের মোট ২ হাজার ৫৪৭টি নিম্নমাধ্যমিকের সব কটিই বেসরকারি বা প্রাইভেট এবং এগুলোর বেশির ভাগেরই মাধ্যমিক স্তরও আছে।

এখান থেকে দুটি প্রবণতা ধরা যায়। প্রথমত, আগের জটিল স্তরবিন্যাস জটিলতর হওয়া। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেসরকারীকরণের দিকে ঝুঁকে যাওয়া।

প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষা: গ্রাম ও শহর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) সাধারণত গ্রামীণ ও শহুরে (রুরাল ও আরবান) উপভাগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভক্ত করে। ‘গ্রামীণের’ বিপরীতে ‘শহুরে’ বলতে বোঝানো

হয় জেলা সদর পৌরসভা, উপজেলা সদর পৌরসভা, উপজেলা সদর অ-পৌরসভা, সিটি করপোরেশন এবং অন্যান্য পৌর এলাকাকে। ব্যানবেইসের ২০২৪ সালের শিক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৭৬ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত।

যথাযথ উপাত্ত বিশ্লেষণের স্বার্থে আমরা গ্রাম ও শহরকে আরও বিভাজিত করেছি। বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন বলছে, দেশে ৪৯৫টি উপজেলায় ৪ হাজার ৫৯৯টি ইউনিয়ন রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের তথ্যানুসারে, জেলা সদর পৌরসভাগুলো বাদ দিলে দেশে মোট পৌরসভা ২৬৫টি (তিন শ্রেণি একত্রে)। অর্থাৎ ইউনিয়ন ও পৌরসভা মিলিয়ে ৪ হাজার ৮৬৪টি প্রশাসনিক ইউনিট।

ব্যানবেইস ইউনিয়ন পর্যায় থেকে গ্রামাঞ্চল বিবেচনা করেছে। আমরা করছি উপজেলা পর্যায় থেকে। এতে শহরাঞ্চল সীমিত হয়ে আসছে শুধু জেলা সদরের ৬৪টি পৌরসভা এবং ১২টি সিটি করপোরেশনে। তাতে দেখা যাচ্ছে, জেলা সদর পৌরসভায় ৮৬০টি ও সিটি করপোরেশনে ১ হাজার ৫৮৯টি মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় আছে। আমাদের বিবেচনাধীন এই ক্যাটাগরিতে শহরাঞ্চলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হার ব্যানবেইস ক্যাটাগরির ২৪ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে মাত্র সাড়ে ১১ শতাংশ। অর্থাৎ শহরের সংজ্ঞা যত সীমিত করা হয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হার তত কমতে থাকে।

এই যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুপাত বোঝার জন্য আমরা শহরাঞ্চলের আরও একটি ক্যাটাগরি করে দেখেছি। সিটি করপোরেশনগুলোর সঙ্গে সাবেক তিন বৃহত্তর জেলা—শিক্ষা বোর্ড থাকা যশোর ও দিনাজপুর এবং সাড়ে তিন হাজারের অধিক প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকা বগুড়া জেলার সম্পূর্ণ আয়তনকে বিশেষ বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছি। তাতে দেখা যাচ্ছে, মোট ১৪টি (ঢাকার দুই সিটি মিলে একটি) বড় শহরে ৩ হাজার ২১৬টি মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় আছে। এগুলোর মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশ সরকারি। ব্যানবেইসের ক্যাটাগরিতে শহরাঞ্চলে এই হার ১৫ শতাংশ।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সিটি করপোরেশনগুলোর পরিসংখ্যান না পাওয়ায় আটটি বিভাগীয় সদর ও অপরাপর ছয়টি বড় জেলার হিসাব কষে দেখা গেছে, এগুলোতে মোট ৪২ হাজার ৮১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সাড়ে ৫২ শতাংশ বেসরকারি, যেখানে জাতীয়ভাবে ৪৫ শতাংশ।

মনে রাখা দরকার, জেলার আয়তন পৌর সদর থেকে অনেক বড়। উপাত্তের চরিত্র বলছে, আকাঙ্ক্ষিত ক্যাটাগরির পরিসংখ্যান পাওয়া গেলে, শহরাঞ্চলের পরিমাণ যেমন কমত, তেমনি শহরে মাধ্যমিক ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হারও অনেক কমত।

এখানে এসে আরও দুটি প্রবণতা পাচ্ছি। প্রথমত, যত শহরায়ণ তত বেসরকারীকরণ। দ্বিতীয়ত, শহরাঞ্চলে জনঘনত্ব বেশি হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

উল্লিখিত এই চারটি প্রবণতা—স্তরবিন্যাস, বেসরকারীকরণ, শহরায়ণ ও প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা—বোঝাপড়া না করে চলমান লটারি বনাম ভর্তি পরীক্ষার বাদানুবাদ নিরসন খুব কঠিন।

লটারির ধাঁধা: ভর্তির রকমফের

আগেই বলেছি, সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হলেও একেক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নীতিমালার রকমফের আমাদের একটি আপাদমস্তক কাঠামোগত সংকটে ফেলেছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে ষষ্ঠ শ্রেণি এবং শহরাঞ্চলে সাধারণভাবে একদম শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই শিক্ষার্থী ভর্তিপ্রক্রিয়া জটিল আকার ধারণ করেছে। দেশে প্রাথমিকের চেয়ে মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮২ শতাংশ কম। ফলে অন্তত মাধ্যমিক স্তরে বাছাই ছাড়া কোনো উপায়ান্তর নেই।

লটারি নামক ভাগ্যপরীক্ষা কিন্তু এ সমস্যা নিরসন করতে পারেনি। তবু এ প্রক্রিয়াকে সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে আহ্লাদের চোখে দেখা লোকের অভাব নেই। তাদের কথা, ভর্তি পরীক্ষার 'ট্রমা' থেকে তো অন্তত শিশুরা বেঁচেছে। নিশ্চয়ই বেঁচেছে। কিন্তু যে শিশুরা ভাগ্যপরীক্ষা নামক অদ্ভুত খেলাকে শিক্ষাজীবনের প্রাক্কালেই 'জীবন বরবাদ' হিসেবে জেনেছে, তাদের ট্রমা নিয়ে ভাবার নেই?

এই ভাগ্যপরীক্ষার ফেরে গ্রামাঞ্চলে কত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর অভিভাবককে বসতবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র, এমনকি অন্য জেলায়, স্থানান্তরিত হতে হয়েছে, এই আহ্লাদিত ব্যক্তিরা কি সেটা বিবেচনা করেছেন? শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যালয় অদলবদলের বা 'মিউচুয়াল এক্সচেঞ্জে'র সুযোগ থাকলেও এর অসারতার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাবে। সেদিকে যাচ্ছি না। শুধু বলতে চাইছি যে ভর্তি পরীক্ষার বিকল্প হিসেবে ভাগ্যপরীক্ষা আসলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকারই নামান্তর।

তথাকথিত এই লটারিতে ভর্তির পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতো টেলিটকের কেন্দ্রীয় সার্ভার তথা অনলাইনের মাধ্যমে। লটারি প্রক্রিয়ায় আসতে বাধ্য বা ইচ্ছুক প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই কেন্দ্রীয় সার্ভারের তালিকাভুক্ত। সার্ভারে না থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কেন্দ্রীয় লটারি বাধ্যতামূলক নয়। এদের লটারি হলেও তা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়। এগুলোতে লটারি থেকে বাদ গিয়ে পরে পরীক্ষা দিয়ে ভর্তিরও নজির আছে।

দেশের কোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লটারি পদ্ধতিতে ভর্তির নিয়ম নেই। লটারি হতো উপজেলা সদরের সরকারি মাধ্যমিক এবং জেলা সদর ও সিটি করপোরেশনের সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। তবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে লটারির মাধ্যমে বাছাইয়ের একটি অদ্ভুত সংকট ছিল। অপরাপর উপজেলাগুলোর জন্য শুধু সরকারি বিদ্যালয় হলেও জেলা সদর উপজেলার প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই লটারি পদ্ধতির আওতায় ছিল। এই নিয়মের গ্যাঁড়াকলে পড়ে জেলা সদর উপজেলার ইউনিয়ন পর্যায়ের বহু এমপিওভুক্ত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থীই পায়নি। অনেক ক্ষেত্রে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনলাইন ফরম পূরণের জন্য শিক্ষার্থী সংগ্রহ করতে হয়েছে তাদের।

পক্ষান্তরে সরকারি বিদ্যালয়ে প্রতিটি শাখায় সর্বোচ্চ ৫৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করার বাধ্যবাধকতা থাকায় চাপ কুলাতে না পেরে অনেক বিদ্যালয় অনুমোদিত দ্বৈত পালা বা ডাবল শিফট খুলেছে। আর যেগুলোর তৃতীয় শ্রেণি থেকে পাঠ শুরু, সেগুলোয় বাইরের প্রতিষ্ঠান থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে সুযোগ পাওয়া যেন এক যুদ্ধজয়।

আবার উপজেলার বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো ছিল অনলাইন প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত। ঐচ্ছিক হওয়ায় কোনোটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কোনোটি হয়নি। তবে হোক বা না হোক, এই প্রতিষ্ঠানগুলো হাতেকলমেও শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারত। ফলে দেখা গেছে, জেলা সদর উপজেলার ইউনিয়নস্থিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থী-সংকটে পড়লেও অপরাপর উপজেলাগুলোর পৌরসভাস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক বেশি শিক্ষার্থী পেয়েছে। অনুমোদন না থাকলেও বাধ্য হয়েই তারা দ্বৈত শিফট খুলেছে।

আশা করি, লটারি নিয়ে যাঁরা আহ্লাদিত, তাঁরা বুঝতে পারবেন, এক লটারির বিবিধ রূপ ও নীতি কত জটিল ও বৈষম্য তৈরি করেছিল। জাতীয় সংকট বুঝতে শুধু কেন্দ্রে চোখ রাখলেই হয় না, প্রান্তেও দেখতে হয় এবং অবশ্যই সমাধান স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করতে হয়।

● **ড. সৌমিত জয়দ্বীপ** সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

[তথ্যঋণ: একটি চলমান গবেষণার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে নিবন্ধটি লেখা। নিবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তগুলো ‘জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০’, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ‘বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিসংখ্যান’ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ‘বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যানে’র যথাক্রমে ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ সালের প্রতিবেদন, বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সংগৃহীত। এ ছাড়া মাঠপর্যায়ে শিক্ষাকার্যক্রমে যুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।]

*মতামত লেখকের নিজস্ব

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৬ প্রথম আলো